HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০১ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক আইনের ধারণা
টপিক ০২: সামাজিক আইন এবং মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১
টপিক ০৩: বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪
টপিক ০৪: যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০
টপিক ০৫: নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩
টপিক ০৬: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯
টপিক ০৭: নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩
টপিক ০৮: হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২
টপিক ০৯: আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা
টপিক ১০: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধানমিকা
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সামাজিক আইনের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক আইনের ধারণা

মানুষ বিধিশাসিত সমাজে বাস করে। সামাজিক জীব হিসেবে তাকে বিভিন্ন বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। এসব বিধি-বিধানের আনুষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে আইন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায়, মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম প্রণীত এবং অনুমোদিত বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনকে আইন বলা হয়। মনীষী অস্টিন (Austin)-এর ভাষায় 'Law is the command of the state.' অর্থাৎ সার্বভৌম শাসকের আদেশই আইন। আইনের বাস্তব সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডব্লিউ উইলসন (W Wilson) বলেছেন, "আইন হলো সমাজের সেসব সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতি-নীতি, যেগুলো সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যেগুলোর পেছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন রয়েছে।”

সামাজিক আইনের ধারণা

উল্লেখ্য ইংরেজি Law এবং Legislation এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক এজেন্সী বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রণীত সামাজিক বিধিবিধান হলো Law বা আইন। অন্যদিকে, যখন আইন প্রণেতা কর্তৃপক্ষ দ্বারা আইন (Law) প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়, তখন তা Legislation এ পরিণত হয়। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, 'Law' বলতে সবধরনের বিধিবিধান এবং আইনকে বুঝায়, যেগুলো রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রণীত। (Law-all the rules established by authority or custom for regulating the behaviour of members of a community or country.) আর 'Legislation'-এর আভিধানিক অর্থ আইন প্রণয়ন বা প্রণীত আইনসমূহ। (Legislation means a law or a series of laws or the process of making laws.) আইন বা Law হলো আইনের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রণীত বিধিবিধানের গঠন (form)। অন্যদিকে আইন যখন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয় তখন তা Legislation-এ পরিণত হয়। Law বা আইন হলো তাত্ত্বিক, আর Legislation হলো ব্যবহারিক বা Law-এর কার্যকর দিক।

সামাজিক আইনের ধারণা

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেসব আইন সমাজ হতে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত, সেগুলোই সামাজিক আইন নামে পরিচিত। সামাজিক প্রগতি ও উন্নতির প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে যেসব আইনগত ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত হয়, সেগুলোই সামাজিক আইন।

সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী, "মানবকল্যাণের প্রয়োজন, আয়ের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, নাগরিক অধিকার, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনকে সামাজিক আইন বলা হয়।”

সমাজকল্যাণ অভিধান (Dictionary of Social Welfare)-এর সংজ্ঞানুযায়ী, "শারীরিক পঙ্গুত্ব, দারিদ্র্য অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে যারা উন্নত জীবন লাভে অক্ষম, সেসব মানুষের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা সমাজের স্বল্প সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণীর জন্য সেবা লাভ নিশ্চিতকরণ এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণকল্পে প্রণীত আইনকেই সামাজিক আইন বলা হয়।”

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, "সমাজের যেসব লোক লিঙ্গ, বয়স, রর্ণ, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে পঙ্গুত্ব অথবা কর্মক্ষমতার অভাবে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক জীবনযাপনে অক্ষম, তাদের রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য গৃহীত আইনকেই সামাজিক আইন বলা হয়।" সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক কল্যাণের (Social Welbeing) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোকে সামাজিক আইন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো সৃষ্টি করে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সামাজিক আইনের মূল লক্ষ্য। সামাজিক আইন সবসময় অবাঞ্ছিত অবস্থা রোধ এবং বাঞ্ছিত সমাজ কাঠামো গঠনে সাহায্য করে। সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সামাজিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ। মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে স্বার্থপরতা। ব্যক্তি স্বার্থকে মানুষ সব সময় সমষ্টি স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকে। সামাজিক আইন সমাজের মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। যাতে মানুষ ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে সমষ্টি ও সামাজিক স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সমাজ অনুমোদিত আচরণ করতে সক্ষম হয়। সামাজিক আইন মানুষকে তার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে একটি মানদন্ড প্রদান করে। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাস করার জন্য মানুষের পক্ষে কী করা উচিত (What a man ought to do?), সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড থাকা প্রয়োজন, তা না হলে মানুষের আচরণ যতোই কুৎসিত বা জঘন্য হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় না। দার্শনিক প্লেটোর মতে, রাষ্ট্রের আইন মানুষের আচরণের এমন এক মানদন্ড প্রদান করে, যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের ক্ষুধা ও প্রবৃত্তিকে সীমিত করে। মানুষের পক্ষে যা করা উচিত অথচ সে করতে চায় না, তাকে তা করতে বাধ্য করে। মনীষী এরিস্টটল আইনের গুরুত্ব তুলে ধরে যথার্থই বলেছেন, "Man when perfected is the best of animals. But if he be isolated from law and justice, he is the worst of all"." অর্থাৎ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিন্তু আইন ও ন্যায়বিচার হতে বিচ্ছিন্ন মানুষ সর্ব নিকৃষ্ট জীব।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সামাজিক আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজ কাঠামো থেকে অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর প্রথা ও বিধিবিধান উচ্ছেদ সাধন। যাতে গঠনমূলক সামাজিক পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখা যায়। সামাজিক আইনের সমর্থন ছাড়া সমাজসংস্কার স্থায়ী হতে পারে না। যেমন আইন প্রণয়ন ছাড়া সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা ইত্যাদি মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক আইনের মাধ্যমে অপরিকল্পিত পরিবর্তন রোধ এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানুষ যাতে সহজে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়, সে জন্য সামাজিক আইন সাহায্য করে।

সামাজিক আইন সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়তা করে। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল, অসহায়, বঞ্চিত শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা সামাজিক আইনের অন্যতম লক্ষ্য।

সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সামাজিক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক আইনের লক্ষ্য সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি বজায় রেখে সামাজিক মূল্যবোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সামাজিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো ভবিষ্যত আর্থিক বিপর্যয়কালীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় মোকাবেলায় সামাজিক আইন মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। এতে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করে।

সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। সামাজিক আইন সমাজের সবশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এতে সামাজিক বৈষম্য দূর হয়। সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং তা সব্রক্ষণের রক্ষাকবচ হিসেবে সামাজিক আইন কাজ করে।

সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সামাজিক আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি যাতে সমাজের সব শ্রেণির জনগণ ভোগ করতে পারে, তার জন্য সুষ্ঠু বণ্টন নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে সামাজিক আইন। সমাজের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা যাতে বিশেষ কোন শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত না হয়, তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সামাজিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের মানুষকে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। যাতে মানুষ আইনগত কাঠামোর অধীনে নিজ অধিকার ভোগের মাধ্যমে, অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যপরায়ন হয়ে উঠে।

সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যত সমস্যা প্রতিরোধ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। কোন সমাজই সমস্যাহীন নয়; সব সমাজেই কোন না কোন সমস্যা বিদ্যমান থাকে। সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিরাজমান সামাজিক সমস্যা প্রতিকার এবং ভবিষ্যত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও সমাধান সম্ভব হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক আইন সমাজকল্যাণের স্বার্থেই প্রণীত হয়। সমাজের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যা ও অবাঞ্ছিত অবস্থা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আইন প্রণীত হয়। এজন্য সামাজিক আইনকে সমাজকল্যাণ ও সামাজিক সংহতির রক্ষাকবচ (Safe guard) বলা হয়।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন

সামাজিক আইন এবং সামাজিক সমস্যার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সামাজিক আইনের মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান সমস্যার প্রতিকার এবং ভবিষ্যত সমস্যা প্রতিরোধে আইনগত ভিত্তি তৈরি করা। সামাজিক সমস্যা হলো মানুষের সমাজবহির্ভূত বিচ্যুত আচার-আচরণ, যার প্রভাবে স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। প্রতিকার এবং গঠনমূলক সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ বিচ্যুত আচরণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়।

সামাজিক আইনের সমর্থন ছাড়া সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করা যায় না। যেমন সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, মাদকাসক্তি, শিশুশ্রম, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা ও অনাচার দীর্ঘ সময় ধরে সমাজে বিরাজমান ছিল। এসব সমস্যা ও অনাচার প্রতিকার ও প্রতিরোধে সামাজিক আইন প্রণয়নের আগ পর্যন্ত সমাজসংস্কারক ও সমাজসেবীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দূর করা সম্ভব হয়নি। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর প্রতিকার এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

সমাজে বিশেষ জনগোষ্ঠী (Special population) রয়েছে, যারা দৈহিক, মানসিক, লিঙ্গ বা বর্ণগত প্রতিবন্ধীতার কারণে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ এবং মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার প্রভাবে সমাজে যৌতুক প্রথা, নারীর প্রতি সহিংসতা, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তিসহ অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। এসব সমস্যা মোকাবেলায় সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রণীত সামাজিক আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলার জন্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক নীতির ভিত্তিতে সামাজিক পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা হয়। সামাজিক নীতি সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় যৌথ প্রচেষ্টা। আর সামাজিক নীতি প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করে সামাজিক আইন। সমাজে যেসব লোকের বিচ্যুত আচরণ অন্যান্যদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক আইনের আওতায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। আদালত, কারাগার, সংশোধনাগার, প্রবেশন, প্যারোল, কিশোর আদালত, মানসিক হাসপাতাল, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান আইনগত বৈধ কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এসব আইনগত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে সমাজবিচ্যুত আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন

রাষ্ট্র প্রণীত অন্যান্য আইনের (যেমন ফৌজদারি আইন) বিষয়বস্তু ও প্রয়োগক্ষেত্র হতে সামাজিক আইনের বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগক্ষেত্র পৃথক। সামাজিক আইন সামাজিক অনাচার ও কুপ্রথা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রণীত। সমাজের দুর্বল, অসহায় ও অক্ষম শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজের মানুষের ভবিষ্যত সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়। যেমন- ফৌজদারী আইনের লক্ষ্য হলো আইন ভঙ্গকারীর শাস্তির বিধান করা। পক্ষান্তরে, সামাজিক আইনের লক্ষ্য হলো অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দান করে, অপরাধ প্রবণতা দূর করা।

সামাজিক আইনের ধারণা

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন

সামাজিক আইন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। সামাজিক সমস্যার প্রতিকার এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবার উন্নয়ন সামাজিক আইনের মূল লক্ষ্য। শিশুকল্যাণ, পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, এতিম ও পরিত্যক্ত শিশু, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন প্রভৃতি আইনগুলো এর বাস্তব উদাহরণ।

মূলত শাস্তিমূলক ফৌজদারী আইন ও দন্ডবিধির বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে সমাজের মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়। সামাজিক আইনের প্রয়োগক্ষেত্র সরাসরি সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক আইনের প্রয়োগক্ষেত্র হলো- সমাজের মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক হতে সৃষ্ট অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করা; দুর্বল, অসহায় ও অক্ষম শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ; সামাজিক অনাচার ও কুপ্রথা হতে সমাজকে মুক্ত রাখা; সমাজের মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা; এবং আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সামাজিক আইনের উপরোক্ত সবগুলো প্রয়োগক্ষেত্রই সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক সমস্যাই সামাজিক আইনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০২ সামাজিক আইন এবং এর ধারা

মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

টপিক ০২: সামাজিক আইন এবং এর ধারা মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

তৎকালীন পাকিস্তন আমলে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আইন মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আইনগত পদক্ষেপ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বিবাহ, তালাক, ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে কতিপয় আইনগত পদক্ষেপ এতে নেয়া হয়েছে। এ আইনটি একাধারে শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইন।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

পটভূমি

তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ছিলেন সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি প্রণয়ন করেন 'দ্য মুসলিম ফ্যামিলি লজ অর্ডিন্যান্স' বা 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' জারি করেন। ২ মার্চ ১৯৬১ সালের পাকিস্তান গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় সেটা প্রকাশিত হয়। আর কার্যকর করা হয় সে বছরের ১৫ জুলাই। সেই থেকে অধ্যাদেশটি আজও বহাল আছে। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ পাকিস্তান আমলের আইন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বলবৎ ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশেও এ আইন বলবৎ রয়েছে।

অধ্যাদেশটির দীর্ঘ শিরোনামের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে গঠিত কমিশনের কতিপয় সুপারিশের প্রতি কার্যকারিতা প্রদানের উদ্দেশে এই অধ্যাদেশটি প্রণীত। আর এর ৩ নম্বর ধারায় যুগান্তরকারী কথাটি বলা হলো, “দেশে বলবৎ থাকা অন্য যে কোনো আইন প্রথা বা রীতি সত্ত্বেও এ অধ্যাদেশের বিধানাবলির কার্যকারিতা বহাল থাকবে।”

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

এ ঘোষণাটি অধ্যাদেশ প্রণয়নকালীন সময়ে প্রেক্ষাপটে খুবই স্পর্শকাতর ছিল। কারণ, অধ্যাদেশটি কার্যকর হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার (ওয়ারিশ), বহুবিবাহ, তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষণ সংক্রান্ত যেসব ইসলামি বা মুসলিম আইন প্রচলিত ছিল এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে তার কিয়দংশ অকার্যকর করা হয়। আর বঞ্চিত মুসলিম নারী ও শিশুদের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে তা করা হয়। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

সালিসী কাউন্সিল গঠন : এ অধ্যাদেশে পারিবারিক বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিসী কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং প্রতিযোগী পক্ষগণের মধ্য থেকে একজন করে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে। পৌর এলাকায় পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক সালিসী কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সংশোধন: এ আইনের ৪নং ধারায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংশোধন আনা হয়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে লা-ওয়ারিশ প্রথাকে বাতিল করা হয়। এ আইনে বলা হয়, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার আগে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যু হলে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হবার সময় ঐ পুত্র বা কন্যার সন্তানাদি যদি জীবিত থাকে, তাহলে ঐ মৃত পুত্র বা কন্যা বণ্টনের সময় জীবিত থাকলে সে যে অংশ পেতো, তার সন্তানাদি সমষ্টিগতভাবে অনুরূপ অংশ পাবে।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ: আলোচ্য আইনের ৫নং ধারায় বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ ধারায় বলা হয়, কোন ব্যক্তির একটি বিবাহ বলবৎ থাকা অবস্থায় সালিস পরিষদের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না এবং এরূপ অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ সম্পন্ন হলে তা রেজিস্ট্রি করা যাবে না। বিবাহ করতে হলে সালিস পরিষদের অনুমতির জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে হবে এবং আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ, প্রয়োজনীয়তা এবং এ বিবাহে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

বিবাহ রেজিস্ট্রি: মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইন অনুসারে বিয়ে রেজিস্ট্রির উদ্দেশে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্ট্রার নামে অভিহিত হন। একটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মাত্র নিকাহ রেজিস্ট্রার থাকবেন। এ আইন অমান্যকারীকে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ: যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে তাকে যেকোন প্রকারে তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশের একটি নকল স্ত্রীকে পাঠাতে হবে। তালাক ঘোষণার পর তা প্রত্যাহার করা না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেয়ার দিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ হবে না।
নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান পক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতার উদ্দেশে সালিস পরিষদ গঠন করবেন এবং সালিস পরিষদ এ সমঝোতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তালাক ঘোষণার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে ৯০ দিন সময় অথবা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। এই আইনের পর থেকে তালাক দ্বারা বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটেছে এরূপ স্ত্রী, এটি তৃতীয়বারের বিয়ে বিচ্ছেদ না হয়ে থাকলে, মধ্যবর্তী সময়ে অন্যকোন পুরুষকে বিয়ে না করেই পুনরায় পূর্ব স্বামীকে বিয়ে করতে পারবেন। অর্থাৎ স্বামীকে বিয়ে করার ব্যাপারে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, তা এ আইনে রহিত করা হয়। তালাক কার্যকর করার ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি তালাকের আইন অনুযায়ী কার্যসম্পাদন না করে, সে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

খোরপোষ: কোন স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত খোরপোষ না দিলে, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সমান খোরপোষ না দিলে, স্ত্রী বা স্ত্রীগণের যে কেউ আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াও স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারবে। চেয়ারম্যান সালিস পরিষদ গঠন করবেন এবং সালিস পরিষদ স্বামী কর্তৃক খোরপোষ হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি সার্টিফিকেট দিতে পারবেন। স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ এই সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আদালতে আপীল করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

দেনমোহর: আলোচ্য অধ্যাদেশে দেনমোহর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, আগে স্ত্রী বা স্ত্রীদের দেনমোহর পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ চাহিবামাত্র তাদের দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

এক নজরে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশের ধারাসমূহ

১. প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি হতে হবে।

২. প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে অর্থাৎ একটি বিয়ে বলবৎ থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। তবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী-স্ত্রীদের মনোনীত প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সালিশ পরিষদের অনুমতি ক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে। সালিশ পরিষদ দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতিদানের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো প্রথম স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, শারীরিক বা মানসিক অসুস্থ্যতা দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা প্রভৃতি।

৩. সালিশ পরিষদের অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করলে স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা পরিশোধে স্বামী বাধ্য থাকবে। অভিযুক্ত হলে স্বামীকে একবছর কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হবে। প্রথম স্ত্রী তালাক দাবি করতে পারবে এবং সমস্ত দেনমোহর পরিশোধে স্বামী বাধ্য থাকবে।

৪. এ আইন অনুযায়ী মৌখিকভাবে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক সম্পন্ন হয় না। কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে, যেকোন পদ্ধতিতে তালাক ঘোষণার পর স্বামীকে যথাশীঘ্র ইউনিয়ন পরিষদের অথবা পৌর চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত নোটিশ দিতে হবে। অনুরূপ কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে। এ ধারা ভঙ্গ করলে স্বামীকে সর্বাধিক একবছর কারাভোগ অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের সাজা ভোগ করতে হবে।

সামাজিক আইন এবং এর ধারা
মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১

৮ নং অধ্যাদেশ

৫. মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ অনুযায়ী একই স্বামী কর্তৃক এক বা দু'বার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিয়ে না করে পুনরায় ঐ স্বামীকে বিয়ে করতে পারেন।

৬. আলোচ্য আইনের ধারা অনুযায়ী দেনমোহরের সব টাকা স্ত্রী চাহিবামাত্র স্বামী দিতে বাধ্য। আইনগতভাবে স্ত্রী দেনমোহরের টাকা চাওয়ামাত্র স্বামীর নিকট হতে আদায়যোগ্য।

৭. স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হলে অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদেরকে সমান খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হলে, স্ত্রীরা আইনানুগ প্রতিকার চেয়ে চেয়ারম্যানের নিকট প্রার্থনা করবেন। চেয়ারম্যান সালিশ পরিষদের মাধ্যমে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। স্ত্রীর খোরপোষ দানে স্বামী যুক্তিসঙ্গত কারণে ব্যর্থ হলে, স্ত্রী তালাক গ্রহণের অধিকারিনী হবেন। যদি স্বামী দু'বছর যাবত ভরণপোষণ না দেয়, তাহলে স্ত্রী তালাক দিতে পারে।

৮. আলোচ্য আইনে পিতা জীবিত থাকাকালীন যদি কোন ছেলে-মেয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির ছেলে মেয়েরা দাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তানেরা দাদার উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। পিতা জীবিত থাকতে যতটুকু সম্পত্তির মালিক হতো, পিতার মৃত্যুর পর ততটুকুই পাবে। এ আইনের আগে মৃত পুত্রের সন্তানেরা দাদার উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হতো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৩ বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

টপিক ০৩: বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

শিশুদের রক্ষণ, হেফাজত, তাদের সাথে ব্যবহার এবং কিশোর অপরাধের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত এবং সংশোধন করার জন্য বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়। এটি শিশুদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রণীত। এ আইন ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশের সর্বত্র বলবৎ করা হয়। এ আইন বলবৎ হবার পর ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন এবং ১৮৯৭সালের রিফরমেটরী স্কুল আইনসহ সংশ্লিষ্ট কতগুলো আইন রহিত করা হয়।

বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪ একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত শিশুকল্যাণমূলক আইন। শিশু আইনে মোট ১০টি অনুচ্ছেদ (Part) এবং ৭৮টি ধারা এবং অনেকগুলো উপধারা রয়েছে। আলোচ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারার মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

১. এ আইনে কিশোর অপরাধীদের জন্য কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে।

২. শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কের পৃথক বিচার ব্যবস্থা থাকবে। এদের একত্রে, একই দালানে, একই সময়ে বিচার করা আইনানুগ নয়।

৩. কিশোর আদালতের বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে শিশুর পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান আলোচ্য আইনে রাখা হয়েছে।

৪. কোন শিশু আদালতে আনীত হবার পর মারাত্মক রোগাক্রান্ত হলে, তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. যে কোন আদেশ দানের পূর্বে আদালতকে কিশোর অপরাধীর চরিত্র, বয়স, জীবন ধারণের পরিবেশ, পারিবারিক অবস্থা, প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

৬. কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংক্রান্ত প্রবেশন অফিসারের রিপোর্টে, শিশুর পরিচয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি গোপনীয় গণ্য করতে হবে।

৭. এ আইনে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের আটক রাখার জন্য রিমান্ডহোম বা কিশোর হাজত স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

৮. শিশু আইন ১৯৭৪-এর বিধান অনুযায়ী শিশু ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণদানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৯. এ আইনের আওতায় সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। যিনি স্থানীয় শিশু আদালত অথবা শিশু আদালত হিসেবে কর্মরত আদালতের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার কর্তব্য পালন করবেন।

১০. এ আইনের বিধান মোতাবেক যাদের হেফাজতে শিশুরা থাকে, তারা যদি শিশুর উপর ক্ষতিকর কোন উৎপীড়ণ বা অবহেলা প্রদর্শন করে তবে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে।

১১. শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ, নেশাগ্রস্ত করা, বাজি ধরতে উৎসাহিত করা, ঋণ গ্রহণে প্ররোচিত করা, পতিতালয়ে বাসের অনুমতি দেয়া, বালিকাকে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করা, শোষণ করা এবং শিশু অপরাধীকে পলায়নে সহায়তা করা প্রভৃতি দন্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য।

১২. গৃহহীন, জীবন ধারণের উপায়হীন, অভিভাবকহীন, ভিক্ষারত পরিত্যক্ত এবং সঙ্গদোষে দুষ্ট শিশুদের আদালতে হাজির করার বিধান আলোচ্য আইনে রয়েছে। কিশোর আদালত এসব শিশুর সার্বিক দিক বিবেচনা করে রিমান্ড হোমে পাঠাতে অথবা কোন আত্মীয়ের হেফাজতে রাখতে পারেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এর উল্লেখযোগ্য ধারাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

ধারা ৩। শিশু আদালত

এ আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার কোন স্থানীয় এলাকার জন্য এক বা একাধিক শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

ধারা ৪। শিশু আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতসমূহ

কিশোর আদালতের যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা অন্য আরও কয়েকটি আদালতকে দেয়া হয়েছে। এসব আদালত হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারি দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং দায়রা জজের আদালত। কিশোর আদালত যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে এসব আদালত শিশু-কিশোরদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার করবেন। এ আইন দ্বারা শিশু আদালতের উপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহ, যেকোন মামলার মূল বিচার বা আপীল-বিচার অথবা পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং সহকারি দায়রা জজের আদালত, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটও প্রয়োগ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ১। শিশু আদালতে যারা হাজির হতে পারবে

এ আইনের বিধান অনুসারে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি শিশু আদালতের এজলাসে উপস্থিত থাকবেন না-

ক) আদালতের সদস্যগণ ও কর্মকর্তা;

খ) আদালতে উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ এবং পুলিশ অফিসারগণসহ মামলা অথবা কার্যধারার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ;

গ) শিশুর পিতামাতা অথবা অভিভাবক; এবং

ঘ) উপস্থিত হবার জন্য আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

ধারা ১৫। আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে

এ আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখবেন-

ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স;

খ) শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ;

গ) শিক্ষানবিস কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট; এবং

ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনার্থে গ্রহণ করতে হবে বলে আদালত মনে করেন সে সকল বিষয়।

তবে শর্ত থাকে, যেক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু কোন অপরাধ করেছে, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে উক্ত মর্মে আদালত তার তদন্ত ফল লিপিবদ্ধ করার পর উপরিউক্ত বিষয়াদি বিবেচনার্থে গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ১৭। মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় ইত্যাদি প্রকাশমূলক রিপোর্ট প্রকাশনার উপর নিষেধ

কোন সংবাদপত্র, পত্রিকা বা সংবাদ ফলকে প্রকাশিত কোন রিপোর্ট অথবা কোন সংবাদদাতা, এজেন্সি এ আইনের অধীনে কোন আদালতে উত্থাপিত কোন মামলা বা কার্যধারা যাতে কোন শিশু জড়িত তার বিস্তারিত বর্ণনা এবং যা এরূপ শিশুকে সনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তা প্রকাশ করবে না বা এরূপ কোন শিশুর ছবি প্রকাশ করবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার বিচারকারী অথবা কার্যধারা গ্রহণকারী আদালত, যদি তার মতে এরূপ রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশু কল্যাণের স্বার্থে অনুকূল হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিশুর স্বার্থের কোন ক্ষতি হবে না বলে মনে করেন, তবে কারণ লিপিবদ্ধ করে উক্ত আদালত এরূপ কোন রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি দিতে পারবেন।

ধারা ১৯। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন

১) সরকার শিশু এবং বাল-অপরাধীগণকে গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

শিশু সম্পর্কিত বিশেষ অপরাধসমূহ

ধারা ৩৪। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড

যার হেফাজত, দায়িত্ব বা তত্ত্বাবধানে কোন শিশু রয়েছে এরূপ কোন ১৬ বৎসরের উপর বয়স্ক ব্যক্তি যদি অনুরূপ শিশুকে এরূপ পন্থায় আক্রমণ, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন অথবা অরক্ষিত হালে পরিত্যাগ করে অথবা করায় যা দ্বারা শিশুটির অহেতুক দুর্ভোগ হয় কিংবা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় এবং কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে তা হলে উক্ত ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

ধারা ৩৫। শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তির জন্য নিয়োগের দন্ড

কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুর নিয়োগদানের অজ্ঞতার ভান করে কিংবা উৎসাহ দেন, অথবা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে আলামতরূপে ব্যবহার করেন তা হলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা তিনশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৩৬। শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে পানোন্মত্ত হবার দন্ড

কোন শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে কোন ব্যক্তিকে যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে, তা কোন দালান হোক বা না হোক, পানোন্মত্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তার মাতলামির কারণে শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করতে অসমর্থ হন তা হলে তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

ধারা ৩৭। শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দন্ড

যদি কোন শিশুকে শিশুর অসুস্থতা অথবা অন্য জরুরী কারণে, যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশক্রম ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে, তা দালান হোক বা না হোক কোন নেশাগ্রস্তকারী সুরা অথবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদান করেন বা করান, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

ধারা ৩৮। সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানসমূহে প্রবেশের অনুমতিদানের দন্ড

যিনি শিশুকে সুরা কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে নিয়ে যান অথবা এরূপ স্থানের স্বত্বাধিকারী, মালিক কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়েও শিশুকে যিনি অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন অথবা যিনি অনুরূপ স্থানে শিশুর যাবার কারণ ঘটান তিনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৩৯। শিশুকে বাজি ধরতে বা ঋণ গ্রহণে উস্কানি দেওয়ার দন্ড

যে ব্যক্তি উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা বা প্রকারান্তরে কোন শিশুকে কোন বাজি ধরতে বা পণ রাখতে অথবা কোন বাজি বা পণভিত্তিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে অথবা শেয়ার নিতে বা স্বার্থসম্পন্ন হতে উস্কানি দেন কিংবা দেওয়ার চেষ্টা করেন অথবা অনুরূপভাবে কোন শিশুকে ঋণ গ্রহণ করতে কিংবা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে উস্কানি দেন, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

ধারা ৪০। শিশুর নিকট হতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করার দন্ড

যে ব্যক্তি কোন শিশুর নিকট হতে কোন দ্রব্য, তা উক্ত শিশু কর্তৃক নিজ তরফ হতে বা অন্য ব্যক্তির তরফ হতে প্রদেয় হোক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করেন তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কোন মেয়াদের কারাদন্ড কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

ধারা ৪১। শিশুকে পতিতালয়ে থাকবার অনুমতিদানের দন্ড

যে ব্যক্তি চার বৎসরের উপর বয়স্ক শিশুকে পতিতালয়ে বাস করতে কিংবা প্রায়শ যাতায়াত করতে সুযোগ বা অনুমতি দেয় তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কোন কোন মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৪২। অসৎ পথে পরিচালনা করানো বা করতে উৎসাহ দানের জন্য দন্ড

যে ব্যক্তি ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোন বালিকার সত্যিকার দায়িত্বসম্পন্ন হয়ে বা তার নিয়ন্ত্রণকারী হয়ে তাকে অসৎ পথে পরিচালিত কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয় অথবা তার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তার সাথে যৌন সঙ্গম করায় বা তজ্জন্য উৎসাহ দেয়, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ব্যাখ্যা: এ ধারার উদ্দেশে, সে ব্যক্তি কোন বালিকাকে অসৎ পথে পরিচালিত করেছেন বা তজ্জন্য উৎসাহ দিয়েছেন বলে গণ্য হবেন যদি সে ব্যক্তি বালিকাটিকে কোন পতিতা কিংবা ভ্রষ্ট চরিত্র বলে জ্ঞাত ব্যক্তির সাথে বাস করতে বা তার অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হতে বা থাকতে জ্ঞাতসারে অনুমতি দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৪৩। অসৎ পথে পরিচালিত হতে অল্পবয়স্ক বালিকাকে ঝুঁকির সম্মুখীন করানো

কোন ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে যদি আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক কোনো বালিকা তার পিতামাতা বা অভিভাবকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসৎ পথে পরিচালিত হওয়া বা বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত হবার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে তা হলে আদালত এরূপ বালিকার ব্যাপারে উপযুক্ত সতকর্তা অবলম্বন ও তদারকি করার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করতে পিতামাতা অথবা অভিভাবককে নির্দেশ দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৪৪। শিশু কর্মচারীদেরকে শোষণের দন্ড

১) যে ব্যক্তি শিশুকে ভৃত্যের চাকরি অথবা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজে নিয়োগের ভান করে কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু কার্যত শিশুটিকে তার নিজ স্বার্থে শোষণ করে বা কাজে লাগায়, আটকে রাখে অথবা তার উপার্জন ভক্ষণ করেন তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

২) যে ব্যক্তি (১) উপধারায় বর্ণিত কোন একটি উদ্দেশের জন্য ভান করে কোন শিশুকে হস্তগত করে কিন্তু তাকে অসৎ পথে চালিত হওয়া, সমকাম বেশ্যাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য নীতি বিগর্হিত পরিবেশে লিপ্ত হবার ঝুঁকির সম্মুখীন করে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৩) কোন ব্যক্তি (১) উপধারায় বা (২) উপধারায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল যে ব্যক্তি ভোগ করে অথবা যার নৈতিকতা বিরোধী বিনোদনের জন্য শিশুকে ব্যবহার করা হয় তিনি দুষ্কর্মে সহায়তার জন্য দায়ী হবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৪৫। শিশু কিংবা বাল-অপরাধীর পলায়নে সহায়তার দন্ড

যে ব্যক্তি, প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউট কিংবা অনুমোদিত আবাসে আটক কিংবা তথা হতে অনুজ্ঞামূলে অন্যস্থানে প্রদত্ত কোন শিশু বা বাল-অপরাধীকে ইনস্টিটিউট, আবাস অথবা যে ব্যক্তির নিকট শিশুকে অনুজ্ঞামূলে রাখা হয়েছিল তার নিকট হতে পলায়ন করতে অথবা কোন শিশুকে এ আইনের অধীনে যে ব্যক্তির হেফাজতে সোপর্দ করা হয় তার নিকট হতে পলায়নে কোন শিশুকে যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে বা প্রলুব্ধ করে তিনি অথবা কোন শিশু বা বাল-অপরাধী প্রত্যায়িত ইনস্টিটিউট বা অনুমোদিত আবাস হতে অথবা তাকে অনুজ্ঞামূলে যার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল কিংবা এ আইনের অধীনে যার হেফাজতে সোপর্দ করা হয়েছিল, তার নিকট হতে পালিয়ে যাবার পর তাকে পুনরায় উক্ত স্থান বা ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করা হতে যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আশ্রয় দেয়, লুকিয়ে রাখে কিংবা বাধা দেয় বা অনুরূপ করতে সাহায্য করে তিনি দুই
মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

ধারা ৪৬। শিশু সম্পর্কিত রিপোর্ট অথবা ছবি প্রকাশের দন্ড

যিনি ১৭ ধারার বিধানাবলী লংঘন করে কোন রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশ করেন তিনি দুই মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

ধারা ৪৭। এই ভাগে বর্ণিত অপরাধ আদালত গ্রাহ্য অপরাধ
কার্যবিধিতে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও এ ভাগের অধীনকৃত সকল অপরাধ আদালতে গ্রাহ্য হবে।
ধারা ৬৯। মিথ্যা তথ্য প্রদানের খেসারত
১) আইনের ৬১ ধারার বিধানের অধীনে কোন ব্যক্তি যে মামলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে সে মামলা সম্পর্কে আদালত তার মতে প্রয়োজনীয় তদন্ত করার পর যদি মনে করেন যে, এরূপ তথ্য মিথ্যা এবং তুচ্ছ এবং বিরক্তিকর তা হলে আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করে নির্দেশ দিবেন যে এরূপ তথ্য সরবরাহকারী, যার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করেছে তাকে একশত টাকার অনুর্ধ সে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করবে।

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪

বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব

বাংলাদেশে শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে ব্যবহার এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধপ্রবণতা সংশোধনের বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটি প্রণীত হয়। বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন এবং কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির পেক্ষাপটে আলোচ্য আইনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। আলোচ্য শিশু আইনটি কিশোর অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করে। ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে এ আইনের আওতায় জাতীয় কিশোর উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এটি গঠিত। অনুরূপ দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি নামক স্থানে জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান আলোচ্য আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে যে হারে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুপাতে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উপজেলা পর্যায়ে শিশু আইন কার্যকরীভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কিশোর অপরাধ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে সময়োপযোগী এবং বাস্তবমুখী আইন হওয়া সত্ত্বেও এটি কিশোর অপরাধ সংশোধনে প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। উল্লেখ্য শিশু আইন ১৯৭৪ এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি রহিত করে শিশু আইন ২০১৩ শিরোনামে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাঁদের।এক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৪ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

টপিক ০৪: যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

বাংলাদেশে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে যৌতুক প্রথা এমনভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, এটি নিরোধকল্পে বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। যৌতুকের মতো অসহনীয় এবং অমানবিক প্রথা নিরোধকল্পে সরকার "যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০" নামে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছেন। অবহেলিত ও নির্যাতিত নারী সমাজের অধিকার ও কল্যাণের লক্ষ্যে যেসব আইন প্রণীত হয়েছে যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। যেকোন ধরনের যৌতুক আদান-প্রদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে এতে গণ্য করা হয়।

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০-এর বিধান মোতাবেক যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষের দ্বারা, অপর পক্ষের প্রতি অথবা বিবাহের সময় বা আগে যেকোন সময় উক্ত পক্ষগণের বিবাহের প্রতিদান হিসেবে, বিবাহের যেকোন পক্ষের পিতা-মাতা দ্বারা অপরপক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিতে সম্মত হওয়া সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝানো হয়েছে। তবে মোহরানা এবং বিবাহের কোন পক্ষ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি জিনিসের মাধ্যমে যার মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক নয়, এরূপ উপহার উক্ত আইন অনুযায়ী যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না।

যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

যৌতুক নিরোধ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিচে হলো-

ক) যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দন্ড : এ আইনের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে, অথবা প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে, সে পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদী কারাদন্ড, যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

খ) যৌতুক দাবির শাস্তি: যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা অথবা অভিভাবকের নিকট হতে যৌতুক দাবি করে তাহলে সে পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত এবং এক বছর মেয়াদের কম নয় অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

গ) যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের চুক্তি বাতিল: এ আইন বলবৎ হবার ফলে, যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের যেকোন চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ) আমল অযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপোষযোগ্য: এই আইনের অধীন প্রতিটি অপরাধ আমল অযোগ্য, জামিন আযোগ্য এবং আপোষযোগ্য বলে গণ্য হবে।

যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

অন্যান্য ধারাগুলো হচ্ছে-

১। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্ন পর্যায়ের কোন আদালতই যৌতুক নিরোধ আইনের কোন অপরাধের বিচার করতে পারবেন না।

২। অপরাধ সংঘটিত হবার তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে নালিশ করা না হলে, কোন আদালতেই অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারের জন্য গৃহীত হবে না।

৩। এ আইনের বিধান মোতাবেক কোন অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে আইন বলে যেকোন দন্ড প্রদানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বৈধভাবে পারঙ্গম থাকবেন।

যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর গুরুত্ব

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক অনাচার হিসেবে বিস্তার লাভকরছে। অসংখ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এবং নারী যৌতুক প্রথার শিকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন এবং অকালে মৃত্যুবরণ করছে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের প্রধান কারণরূপে যৌতুক প্রথা বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি যেমন নারী সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তেমনি পারিবারিক সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সহায়ক হচ্ছে। যদিও সামাজিক সচেতনতা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে বাস্তবে এ আইনের কার্যকারিতা ব্যাপকহারে

পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি যৌতুক নিরোধের প্রথম আইনগত পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে আলোচ্য আইনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। আইনগত ভিত্তি থাকায় সমাজে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে নেতিবাচক পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৫ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

টপিক ০৫: নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে সমাজের সকল স্তরে নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সমাজে নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা এমন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, প্রচলিত আইনে এসবের বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক "নারী নির্যাতন (নির্বতক শাস্তি) অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩" [The Cruelty of Women (Deterrent Punishment) Ordinance-1983] জারি করেন। বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে বসবাসরত অন্য যেকোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলোচ্য আইনটি প্রযোজ্য।

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

এ আইনের প্রধান বিধান ও ধারাসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলো-

১ । বে-আইনী বা নীতি বিবর্জিত উদ্দেশ্যে নারী অপহরণের দন্ড : কোন স্ত্রীলোককে (যে কেউ, যেকোন বয়সের) হরণ বা বলপূর্বক অপহরণ (Kidnapping or Abduction) করে ক. পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, নৈতিকতাহীন কাজে ব্যবহার; খ. স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া; গ. অবৈধ যৌন সঙ্গমে বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

২। নারী ক্রয়-বিক্রয় দন্ড: যে কেউ যেকোন বয়সের নারীকে বেশ্যাবৃত্তি, নিষিদ্ধ যৌন সহবাস বা নীতি বিবর্জিত উদ্দেশে নিয়োগ অথবা ব্যবহারের জন্য নারী পাচার, ক্রয় বা বিক্রয়, ভাড়া অথবা অন্যভাবে কবজা করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৩। যৌতুকের কারণে মৃত্যু ইত্যাদি সংঘটনের দন্ড: এ আইনের বিধান মোতাবেক কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক বা আত্মীয় যে কেউ যৌতুকের জন্য যদি মৃত্যু ঘটায় বা সংঘটনের প্রচেষ্টা চালায় বা গুরুতর জখম করে, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৪ । ধর্ষণ ইত্যাদি কারণে মৃত্যু সংঘটনের দন্ড: যে কেউ ধর্ষণ বা ধর্ষণের প্রচেষ্টা হতে কোন নারীর মৃত্যু ঘটালে অথবা ধর্ষণের পর কোন নারীকে হত্যা করলে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং তৎসহ জরিমানাযোগ্য হবে।

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

৫। ধর্ষণ প্রচেষ্টা ইত্যাদি থেকে মৃত্যু সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা গুরুতর জখম করার দন্ড: যে কেউ ধর্ষণবা ধর্ষণের প্রয়াসে কোন নারীর মৃত্যু সংঘটনের প্রচেষ্টা করলে বা তাকে গুরুতর জখম করলে তাহলে দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৬। অপরাধসমূহের সহায়তা: আলোচ্য অধ্যাদেশে বর্ণিত শাস্তিযোগ্য যেকোন অপরাধের সহায়তা করলে এবং সহায়তার পরিণামে অপরাধ সংঘটিত হলে সহায়তাকারীকেও অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে।

উপরোক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধের প্রতিটি ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

আইনের গুরুত্ব

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে প্রণীত প্রথম আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন অধ্যাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। নারী সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে নিশ্চয়তাদানের ক্ষেত্রে এটি একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এটি বাস্তবায়নের যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে, নারী সমাজের কল্যাণ বিধানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য ১৯৯৫ সালে আলোচ্য আইনটি রহিত করা হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ প্রণয়নের মাধ্যমে আইনটির অনেক ধারা বলবৎ করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৬ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯

টপিক ০৬: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯ প্রণীত হয়।

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আলোচ্য আইনে রাখা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচ্য আইনে রাখা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯ এর প্রধান ধারাগুলো আলোচনা করা হলো-

অধ্যাদেশের বিধানে জাতীয় মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দায়িত্ব। বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা দান এবং বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখা হয়। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনকল্পে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিধান এ অধ্যাদেশে সংযোজন করা হয়।

অধ্যাদেশে মাদকাসক্ত বলতে শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল বা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ববহারকারীকে বুঝানো হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯

দন্ড : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯-এর ধারা মোতাবেক মাদক দ্রব্যের শ্রেণীবিন্যাস করে সে অনুযায়ী দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

ক. হেরোইন, কোকেন, পেথিড্রিন, মরফিন প্রভৃতি হতে উদ্ভূত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ২৫ গ্রাম হলে দু'বছর হতে ১০ বছরের কারাদন্ড; মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রামের উর্ধ্বে হলে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তি গাঁজা চাষ, এ্যালকোহল প্রস্তুত, মেথিলেটেড স্পিরিট প্রস্তুত করলে দু'বছর হতে ১০ বছরের কারাদন্ডে দণ্ডিত হবেন।

খ. তাছাড়া মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট অপরাধে গৃহ বা যানবাহন ব্যবহার, লাইসেন্স ব্যতীত কাজ করা বা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা দিলে দু'বছর হতে পনের বছর পর্যন্ত দন্ডদানের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া লাইসেন্স বাতিল, স্থগিতকরণ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের গুরুত্ব

মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সাথে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রতি এতে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আলোচ্য আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৮৯ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের আওতায় মাদকাসক্তিজনিত সমস্যা প্রতিরোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ১৯৯০ সালে আলোচ্য আইনটি সংশোধন করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৭ নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩

টপিক ০৭: নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩

সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে পাস করা নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৩ জুলাই ২০০৩ মূল আইনে অর্থাৎ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর সংশোধনী এনে বিল পাস করা হয়। আইনটির শিরোনাম হলো "নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন ২০০৩"। এর মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০০-এর ১২টি অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে নির্যাতন সম্পর্কিত ছ'টি ধারায় এবং অপরাধের বিচার ও তদন্ত সম্পর্কিত ছ'টি ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে। এছাড়া নতুন সংযোজিত হয়েছে আত্মহত্যার প্ররোচনা ধারা। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন-২০০৩ এর মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর যেসব ধারাগুলোর বিষয়ে সংশোধন আনা হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩

ক) সংশোধন আইনে শিশু বলতে ১৪ বছরের পরিবর্তে অনধিক ১৬ বছরের বয়স্কদের বুঝানো হয়েছে।

খ) সংশোধিত আইনে অহেতুক হয়রানি রোধে যৌতুকের সংজ্ঞা সংশোধন করে, শুধু প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের (বর বা কনের পিতা ও মাতা) অভিযুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। বিয়ের সময় বর পক্ষের কোন ব্যক্তি কনে পক্ষের কাছ থেকে টাকা, সম্পদ, কোন সামগ্রী নেয়া বা অন্যকোন সম্পদ দিতে সম্মত হওয়া, সেটি যৌতুক বলে গণ্য হবে। এজন্য উভয় পক্ষকে অভিযুক্ত করা হবে।

গ) সম্ভ্রমহানির কারণে নারীর আত্মহত্যা করার ক্ষেত্রে, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান করে, আইনটিতে নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এজন্য ১০ বছর কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ধারাতে আত্মহত্যার প্ররোচনা হিসেবে সম্ভ্রমহানি ঘটার পর আত্মহত্যা করলে, তবেই আত্মহত্যার প্ররোচনা হিসেবে অভিহিত হবে।

ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০০-এর ধারা ১০-এর উপধারা ২-এর যৌন হয়রানি অর্থাৎ অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা কথার মাধ্যমে উত্যক্ত করা, ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে। মূল আইনে আলোচ্য উপধারাটি ছিল কোন পুরুষ অবৈধভাবে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশে কোন নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তার অপরাধ হবে যৌন হয়রানি এবং সেজন্য উক্ত পুরুষ সর্বনিম্ন দু'বছর থেকে সর্বোচ্চ সাত বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় শাস্তির বিধান ও অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩

ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর মূল আইনে ১০নং ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছিল কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা পূরণের উদ্দেশে তার শরীরের যেকোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা, কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্যকোন অঙ্গ স্পর্শ করলে তার উক্ত কাজ হবে যৌনপীড়ণ। এক্ষেত্রে অভিযুক্তের শাস্তি হবে ন্যূনতম তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

চ) ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া শিশুর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর মূল আইনে, ধর্ষকের উপর ছিল এবং সন্তান কার তত্ত্বধানে থাকবে এবং ধর্ষক থেকে সন্তানের ভরণপোষণের খরচ কী পরিমাণ আদায় করা হবে, তা ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করে দিবে। এ ধারা বাস্তবায়নে বিবিধ সমস্যা থাকায় সংশোধিত আইনে সন্তানের দায়িত্ব রাষ্ট্র নেবে এবং অর্থ আদায়ের দায়িত্ব সরকার পালন করবে। আর জন্ম নেয়া সন্তান, বাবা অথবা মা অথবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে।

ছ) সংশোধিত আইনে কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা রুদ্ধদ্বার কক্ষে (Trial in camera) পরিচালনা করার বিধান রাখা হয়েছে।

জ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন হলো, অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে পরিবর্তন। এক্ষেত্রে অভিযুক্তকে যদি অপরাধ সংঘটনের সময় হাতে নাতে ধরা হয়, সে ক্ষেত্রে ধরা পড়ার ১৫ দিনের মধ্যে বিচার কার্য শুরু করতে হবে। আগে এ সময়সীমা ছিল ৩০ দিন।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইন ২০০৩

পর্যালোচনা

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন-২০০৩ সময়ের পরিবর্তন ও বাস্তবতার আলোকে সংশোধন করা হয়। তবে সংশোধিত আইনে নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নারীর প্রতি গৃহসহিংসতা, জোরপূর্বক গর্ভপাত, পর্নোগ্রাফি, নারীর নিরাপদ চলাচলে বাঁধা প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যৌন হয়রানি অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গি, শরীর স্পর্শ না করে পুরুষ কর্তৃক অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ, উত্যক্ত করা ইত্যাদির জন্য অপরাধী হওয়ার ধারা বাদ দেয়া হয়েছে।

মৌখিকভাবে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে উত্যক্ত করার মতো ভয়াবহ মানসিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার আইনি সুযোগ ও অধিকার নারীদের রয়েছে। অথচ সে ধরনের আইনি সুযোগ সংশোধনীতে পরিলক্ষিত হয়নি।

সংশোধিত আইনে সংযোজিত নতুন ধারায় সম্ভ্রমহানি ঘটার পর আত্মহত্যা করলে, তাহলেই আত্মহত্যার প্ররোচনা হিসেবে অভিহিত হবে। কিন্তু সম্ভ্রমহানি ঘটা ছাড়া শুধু মৌখিক উত্যক্তকারীদের মানসিক নির্যাতনের কারণে আত্মহননে বাধ্য হলে অপরাধ বলে গণ্যের ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে।

ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান, পিতা হিসেবে ধর্ষকের পরিচয় দিবে অথবা ধর্ষিতার পরিচয়ে পরিচিত হবে। আমাদের সমাজ তা কতটুকু গ্রহণ করবে, সেটা বিবেচনার দাবি রাখে।

সুতরাং আইন সংশোধনের সঙ্গে আইনের যথার্থ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে আইনের অপ-প্রয়োগের মাধ্যমে কেউ হয়রানি করতে না পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৮ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

টপিক ০৮: হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়নের উদ্দেশে প্রণীত আইন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় আলোচ্য হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

আইনের প্রধান ধারাগুলো উল্লেখ করা হলো।

১। সক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন-

(ক) এই আইন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ নামে অভিহিত হবে।

(খ) এটি নাগরিকত্ব নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২।সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ আইনে-

(ক) হিন্দু অর্থ বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কোন নাগরিক;

(খ) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক অর্থ ধারা ৪ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক;

(গ) হিন্দু বিবাহ অর্থ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পন্ন ও হিন্দু শাস্ত্র মোতাবেক প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী অনুমোদিত বিবাহ।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

৩। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন

(ক) অন্য কোন আইন, প্রথা ও রীতি-নীতিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশে হিন্দু বিবাহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন করা যাবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন হিন্দু বিবাহ এ আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হলেও তার কারণে কোন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হবে না।

৪। বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ

(ক) এ আইনের অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের উদ্দেশে, সরকার, সিটি করপোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে তদকর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এলাকা এবং সিটি করপোরেশন বহির্ভূত এলাকার ক্ষেত্রে প্রতিটি উপজেলা এলাকায় একজন ব্যক্তিকে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।

(খ) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে অভিহিত হবেন।

৫। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ: অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, ২১ (একুশ) বছরের কম বয়স্ক কোন হিন্দু পুরুষ বা ১৮ (আঠার) বছরের কম বয়স্ক কোন হিন্দু নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা এ আইনের অধীনে নিবন্ধনযোগ্য হবে না।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

৬। বিবাহ নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি

(ক) হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত বিয়ের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশে, বিবাহের যে কোন পক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ নিবন্ধন করবেন।

(খ) এ আইন কার্যকর হবার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত কোন বিবাহের যে কোন পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আইনের বিধান অনুসরণক্রমে নিবন্ধন করা যাবে।

৭।বিবাহ নিবন্ধক ফিস: সরকার সময় সময়, বিধি দ্বারা, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ফিস, নিবন্ধন বহি পরিদর্শন ফিস এবং প্রতিলিপি সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ফিস নির্ধারণ করতে পারবে।

১২।বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি প্রদান

(ক) এ আইনের অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিবাহের পক্ষদ্বয় বা তদকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি সরবরাহ করবেন।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

১৩। তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি

(ক) প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জেলার, জেলা রেজিস্ট্রারের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থেকে তার দাপ্তরিক ও অর্পিত দাযিত্ব সম্পন্ন করবেন।

(খ) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণের উপর মহাপরিদর্শক, নিবন্ধক এর সাধারণ তত্বাবধানের ক্ষমতা থাকবে।

(গ) জেলা রেজিস্ট্রার তার স্থানীয় অধিক্ষেত্র এলাকায় যে কোন সময় যে কোন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় পরিদর্শন করতে পারবেন।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২

আলোচ্য আইনের গুরুত্ব

দেশে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কোন আইনগত ব্যবস্থা না থাকায় আলোচ্য আইনটির বাস্তব গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দু বিবাহ ধর্মীয় রীতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় বিধায় বিবাহের কোন দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষা করা হয় না। যথাযথ তথ্য প্রমাণাদি সুরক্ষার অভাব, বর এবং কণে উভয় পক্ষ বিশেষ করে নারীরা বিবাহ সংশ্লিষ্ট প্রতারণার শিকার হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অধিকার সংরক্ষণে বিশেষকরে নারীদের অধিকার সংরক্ষণে আলোচ্য আইনটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

আইনের দুর্বল দিক হলো ধারা ৩ (তিন) এর উপধারা ২ (দুই) অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক না হয়ে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আইনের মূল উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ০৯ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

টপিক ০৯: আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সামাজিক আইন একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়। সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে বা পর্যায়ে বিভক্ত।

ভারতের ড. ডি পল চৌধুরী (Dr. D Paul Chowdhury) সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার দশটি পর্যায় বা ধাপের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- (১) সামাজিক আইন প্রণয়নের জন্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ; (২) সমাজ সংস্কার আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন বা প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ; (৩) জনমত গঠন; (৪) জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ; (৫) আইন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে আইনের বিল তৈরির বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরণ; (৬) আইনের খসড়া বিল তৈরি; (৭) খসড়া বিল পর্যালোচনার জন্য আইন বিশেষজ্ঞ নির্বাচন; (৮) বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইনের বিল চূড়ান্তকরণ; (৯) আইন সভায় বিল উপস্থাপন ও অনুমোদন; (১০) রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের মাধ্যমে আইন পরিষদে পাসকৃত বিল আইনে পরিণতকরণ।

সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং প্রণীত আইন প্রয়োগে সমাজকর্মীদের ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

প্রথম, সামাজিক আইন প্রণয়নের প্রথম ধাপ হলো সমস্যা চিহ্নিতকরণ। সমাজকর্মীরা গবেষণার মাধ্যমে সমাস্যার প্রভাব, পরিধি, সমস্যার কারণ, সমস্যা মোকাবেলায় আইন প্রণয়নের গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করে সমস্যা চিহ্নিতকরণে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে সামাজিক আইন প্রণয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

দ্বিতীয়, সামাজিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মৌলিক উপাদান হলো জনমত। সামাজিক আইন প্রণয়নে চিহ্নিত সমস্যার বিস্তৃতি, প্রভাব, মোকাবেলার উপায় হিসেবে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনে সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) প্রয়োগ করে সমাজকর্মীরা সামাজিক আইন প্রণয়নের পক্ষে জনমত গড়ে তোলতে সাহায্য করতে পারেন। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি, আইন প্রণেতাদের সঙ্গে প্রতক্ষ্য যোগাযোগ এবং সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে জনমত গঠনে সমাজকর্মীরা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

তৃতীয়, সমাজকর্মীরা খসড়া বিল তৈরির সময় আইনের উদ্দেশ্য, ধারা, পরিধি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাচিত আইন বিশেষজ্ঞদের বাস্তব তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন।

চতুর্থ, সামাজিক আইনের কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান ও ধারণার উপর। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট সামাজিক আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলতে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন। আইনের পরিধি, গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সমাজকর্মীরা সচেতন করে তোলতে সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

পঞ্চম, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং এজেন্সীর সদস্য হিসেবে সমাজকর্মীরা আইন প্রয়োগে ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন প্রবেশন অফিসার ও প্যারোল অফিসার হিসেবে সমাজকর্মীরা সংশ্লিষ্ট সামাজিক আইন প্রয়োগে ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়া শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ এবং সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সামাজিক এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মীদের সামাজিক আইন প্রয়োগে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ১০ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। Legislation এর অর্থ হলো-

ক. প্রণীত আইনসমূহ খ. আইন

গ. রাষ্ট্রীয় বিধান ঘ. আইন প্রণেতা

২। কিশোর আদালতের আইনগত ভিত্তি হলো-

ক. শিশু আইন ১৯৭৪ খ. নারী নির্যাতন আইন ১৯৮৩

গ. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ঘ. যৌতুক নিরোধ অধ্যাদেশ ১৯৮০

৩।কোন আইন দ্বারা শিশু অপরাধের জন্য পৃথক আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

ক. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ খ. শিশু আইন ১৯৭৪

গ. নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ ঘ.পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স

৪। নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ কত সালে প্রথম প্রণীত হয়?

ক. ১৯৬৩ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৮৩ ঘ. ১৯৯৩

৫।মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ কখন প্রণীত হয়?

ক. ১৯৮৩ খ. ১৯৮৫ গ. ১৯৮৯ ঘ. ১৯৯০

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?

ক. সামাজিক আইন
খ. পারিবারিক আদালত
গ. ফৌজদারী আইন
ঘ. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স

৭। বাংলাদেশে যৌতুক আইন ১৯৮০ অনুযায়ী প্রতিটি অপরাধ হলো-

ক. জামিনযোগ্য
খ. শাস্তিযোগ্য
গ. আপোষ অযোগ্য
ঘ. জামিন অযোগ্য

৮।সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য কী?

ক. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা
খ. সুবিচার প্রতিষ্ঠা
গ. সামাজিক বৈষম্য দূর করা
ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

৯। সামাজিক আইন কেন প্রণীত হয়?

ক. অপরাধীদের শাস্তি দিতে
খ. সমাজকল্যাণের স্বার্থে
গ. রাষ্ট্রের প্রয়োজনে
ঘ. ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষণে

১০। রায়হান সাহেব তার স্ত্রীকে তালাক দিতে মনস্থির করেন। এক্ষেত্রে তাকে প্রথমে কী করতে হবে?
ক. স্ত্রীকে তার বাবার বাড়ি পাঠাতে হবে
খ. পাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মতামত জানতে হবে
গ. আদালতের দারস্থ হতে হবে
ঘ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে

১১। বাংলাদেশে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
খ. কিশোর অপরাধ প্রবণতা সংশোধন
গ. সার্বিক শিশু কল্যাণ
ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

১২। সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য হলো-
i. মানুষের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ
ii. সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টন
iii. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. I
খ. ii এবং iii
গ. ii এবং I
ঘ. i, ii এবং iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১। উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রফেসর রহমান দৈনিক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। একটি সংবাদ তার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। হারান খুব ভাল ছেলে। তার মা বাবা তার জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করছেন। বাবা মা তাদের কর্মব্যস্ততার জন্য হারানকে সময় দিতে পারেন না। হারান তার বন্ধুদের নিয়ে সময় কাটায়। একদিন একটি দামি মোবাইল সেটের জন্য বন্ধুরা তাকে হত্যা করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় তারা সবাই বখাটে ও মাদকাসক্ত ছিল। হত্যাকারি হওয়া সত্বেও তাদের বয়স কম থাকায় প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করা যাচ্ছে না।

ক. সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী সামাজিক আইন কাকে বলে?

খ. মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর উদ্দেশ্য কী?

গ. হত্যাকারি হওয়া সত্বেও হারানের বন্ধুদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যাচ্ছে না কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. যে আইনে হারানের বন্ধুদের বিচার করা যাবে, সে আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

THANK YOU